the ULABian

A STUDENT MOUTHPIECE

Contains exclusive Bangla and English content...

জানুয়ারী, ২০১৩

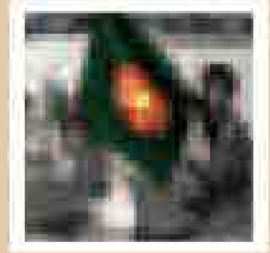

সম্পাদকীয় — ০২
নতুন স্বপ্নের আশায়

কথোপকথন — ০৩
সাক্ষাৎকার

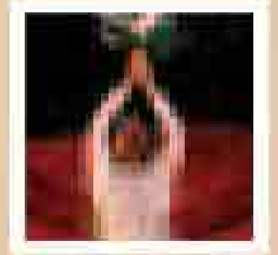

ইউল্যাব বারতা — ০৪
গালা নাইট্স্
ক্যারিয়ার ফেয়ার ২০১২

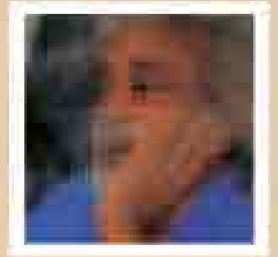

ইউল্যাব বারতা — ০৫
দোহার ১৯৭১ এবং আনোয়ার হোসেন
ব্যাট্ল্ অব টেলিকম্

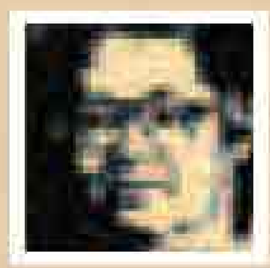

কিংবদন্তি — ০৬
নীললোহিত

০৭ — কিংবদন্তি
জহির রায়হানের চেতনায়
বর্তমান প্রজন্ম

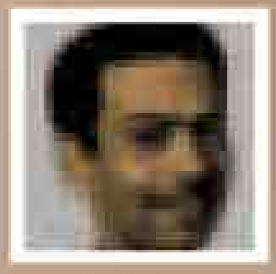

০৮ — চরিতগাথা
কষ্টের কোরাস
০৯ — তাচ্ছিল্য নয় চাই সমর্থন

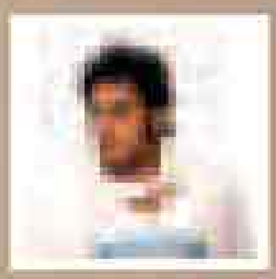

১০ — অপরূপ কথা

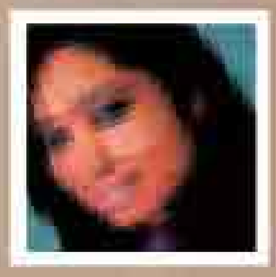

১১ — পর্যলোচনা
গ্রন্থ পর্যলোচনা: ঘুম নেই
চলচ্চিত্র পর্যলোচনা: ঘেটুপুত্র কমলা

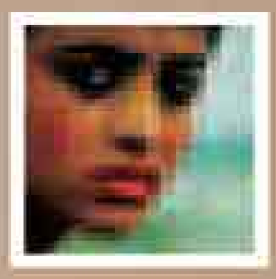

১২ — ছবির গল্প
বৃদ্ধাশ্রম

সম্পাদকীয়

প্রধান উপদেষ্টা
ডঃ জুড উইলিয়াম হেনিলো

উপদেষ্টা সম্পাদক
বিকাশ সিএইচ ভৌমিক

সম্পাদক
সাউদিয়া আফরিন

উপ-সম্পাদক
কানিজ ফাতেমা
মদিনা জাহান রিমি

ইউল্যাবিয়ান দল
তাশফিক মাহমুদ
ফজলে রাব্বি খান
সিউল আহমেদ
জাহিদ হাসান
সজল বি রোজারিও
প্রেমা ধর
সৌরভ ঘোষ
অনামিকা সিদ্দিকা
সানজিদা হক
আয়শা খান
নাজমুছ সাকিব প্রকৃতি

নকশা ও অলংকরণ
থ্রিআর মিডিয়া এন কম্যুনিকেশনস

রেখাচিত্র
আনোয়ার হোসেন
ইউল্যাবিয়ান ফটো আর্কাইভ
ইন্টারনেট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
আরিফুল হক
রওনক আফজা
মোঃ নাঈম খান

পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।
আপনার মতামত পাঠাতে পারেন এই ইমেল ঠিকানায়:
theulabian@ulab.edu.bd

নতুন স্বপ্নের আশায়

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে এই দিনে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। পৃথিবীর বুকে সেদিন জন্ম নিয়েছিল এক স্বাধীন ভূখন্ড। যার নাম বাংলাদেশ। যেখানে প্রতিটি মানুষের বুকে ছিল দেশের জন্য জীবনকে বাজী রেখে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার প্রকট স্পৃহা ও অদম্য সাহস। আমাদের আজকের এই প্রজন্ম বিজয়ের ইতিহাস শুনেছে প্রবীণদের মুখে, পড়েছে বইয়ের পাতায় অথবা দেখেছে সিনেমার পর্দায়।

এই বিজয় একদিনে অর্জিত হয়নি। সত্যিকার অর্থে এর বীজ বপন হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান ভাগের পরবর্তী সময় থেকেই। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ৭১'র মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত আমরা হারিয়েছি লাখো প্রাণ। সেই সকল প্রাণের প্রতি রইল সালাম।

নাহ্ আমি আজ বিজয়ের ইতিহাস বলার জন্য কলম তুলে ধরিনি। শুধু বলতে চাই ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষের জীবন কতটুকু বদলেছে?

> না আমি আজ বিজয়ের ইতিহাস বলার জন্য কলম তুলে ধরিনি। শুধু বলতে চাই ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষের জীবন কতটুকু বদলেছে?

বছরের এই শেষ মাসটি নিয়ে বাঙালির উত্তেজনা ও উল্লাসের সীমা যেন অসীম। তাই বিজয়ের মাসে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সফলতা সমস্ত বাঙালি জাতির সুখের অনুভূতিগুলোকে বাড়িয়ে দিয়েছিল কয়েকগুণ। কিন্তু, তার ঠিক পরের দিন যে ঘটনাটি ঘটল তা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কি আমাদের কাম্য ছিল? বিনা কারণে একজন নিরীহ বাঙালি গুটিকয়েক উগ্রপন্থী বাঙালির হাতে নৃশংস মৃত্যু! বলছি বিশ্বজিৎ দাসের কথা। এর পরের ঘটনা, আমাদের সবার জানা। শুধু এই গুচ্ছ ঘটনাপ্রবাহ নয়, স্বাধীনতার পরে এরকম আরো বহু ঘটনা ঘটেছে যার ফলে সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে অসহায়ত্ব ও নিরাপত্তা সংশয়, ঠিক যেমনটি ছিল স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে। আর এ কারণেই সেদিন চারিদিকে দাড়িয়ে মানুষ শুধু দেখেছে, বিশ্বজিৎকে বাঁচানোর জন্য দু'টি হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সাহস কারোর ছিলনা। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগের পর তেইশ বছর ধরে বাঙালি লড়াই করেছিল নিজেদের অস্তিত্বের জন্য। আর বর্তমানকালে ক্ষমতার লোভে হানাহানির রাজনীতি আমাদের যেন ফিরিয়ে নিয়েছে পূর্বের অবস্থানে। ফলাফল স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছর পরও সাধারণ মানুষের মনে সেই নিরাপত্তাহীনতা যা দিনদিন বেড়েই চলছে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালেই একটা ব্যাপার বারবার চোখে পড়ে, একজনকে পেছনে ফেলে অন্যজনের সামনে এগিয়ে যাওয়া। একজনের মৃত্যু, অপরজনের সফলতা। আর এই সফলতার মূলে রয়েছে ক্ষিপ্রতা। তবে, চারিদিকে যখন মানবতার জয়জয়কার তখনও কি শুধু ক্ষমতার লোভে সভ্য সমাজের কাছে এমন নৃশংস আচরণ কাম্য?

বেশ কিছুদিন আগে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের একটি বইয়ে পড়েছিলাম "একটা জাতি চিরদিন এক রকম থাকে না। এ জাতিও থাকবে না।" সায়ীদ স্যারের এ উক্তি প্রতিনিয়ত মনে সাহস যোগায়, অনুপ্রাণিত করে আবার নতুন একটি স্বপ্ন দেখার জন্য...

সাউদিয়া আফরিন

সাক্ষাৎকার

অ**ধ্যাপক ডঃ জহিরুল হক** ২০০৪ সালে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান হিসেবে ইউল্যাব-এ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে তিনি ইউল্যাবের একজন অধ্যাপক এবং একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এ সংখ্যায় কথোপকথনে থাকছে অধ্যাপক হকের সঙ্গে ইউল্যাবিয়ান প্রতিবেদক **কানিজ ফাতেমার** আলাপচারিতা।

কা.ফাঃ ইউল্যাবের সাথে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন কোন পার্থক্যগুলো আপনার চোখে বেশী পড়ে?

অ.হকঃ এর উত্তরে দু'টি বিষয়ের কথা আমি বলব যা ইউল্যাবকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করেছে। একটি হল এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপদ্ধতি এবং অন্যটি হল এর শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ।

কা.ফাঃ ইউল্যাবিয়ান পাঠকদের যদি একটু খুলে বলেন?

অ.হকঃ এ পাঠ্যক্রমের স্বতন্ত্র বিষয়টি হলো এটি লিবারেল আর্টস শিক্ষা ধারণাকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। পরিষ্কার করে বললে-এ পাঠ্যক্রমের অধীনে একজন শিক্ষার্থীকে নিজ ডিপার্টমেন্টের বিষয়গুলোর পাশাপাশি অন্য ডিপার্টমেন্টের কিছু বিষয়েও জ্ঞানার্জন করতে হয়। অর্থাৎ, বিবিএ এর শিক্ষার্থীদেরকে সিএসই বা মিডিয়া স্টাডিজের কিছু বিষয় নিয়ে পড়তে হয় এবং উল্টোভাবেও এটি সত্য। এ পাঠ্যক্রমে প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে নিজ বিষয় বহির্ভূত পনেরটি বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। অন্যদিকে, ইউল্যাবের পাঠপদ্ধতি এর বিশিষ্টতাকে আরো উজ্জ্বল করেছে। এটি লার্নিং বাই ডুইং অর্থাৎ অ্যাক্টিভ লার্নিং পদ্ধতিকে শিক্ষা গ্রহণের মূল মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ শুধু শ্রেণীকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি সংগঠিত হয় শেণীকক্ষের বাহিরেও। তাই ইউল্যাব শিক্ষার্থীদেরকে এর বিভিন্ন কো-কারিকুলার এবং ক্লাব কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যা তাদের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আর, শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ বলতে বোঝানো হচ্ছে - ইউল্যাবের সাংস্কৃতিক পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষকের হৃদ্যতামূলক সম্পর্ক, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি।

কা.ফাঃ কিভাবে অন্য ডিপার্টমেন্টের বিষয়গুলোর প্রতি আপনারা শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেছেন বা করছেন?

অ.হকঃ শুরুতে শিক্ষার্থীরা জেনারেল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট (জিইডি)-এর বিষয়গুলো নিতে খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। আমরা বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ফোরামের মাধ্যমে তাদের আগ্রহ তৈরী করেছি এবং করছি। এখন তারা বুঝতে পারছে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক চাকুরীর বাজারে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ার জন্য বহুমুখী জ্ঞান অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষার্থীরা লিবারেল আর্টস শিক্ষা অর্জনের জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন।

কা.ফাঃ বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ইউল্যাবের শিক্ষার্থীগণ কতটুকু দক্ষতা অর্জন করছে বলে আপনি মনে করেন?

অ.হকঃ ইউল্যাবের শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা

গ্রহণকালীন সময়ে যে দক্ষতা অর্জন করছে তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা যথেষ্ট। কিন্তু, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগীতায় যেতে হলে আরো বেশী দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম ও প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তাদের সে দক্ষতা ভবিষ্যতে তাদেরকে উন্নতির শিখরে পৌছে দেবে।

কা.ফাঃ ইউল্যাবের শিক্ষার্থীদের আরও বেশি যুগোপযোগী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

অ.হকঃ যুগোপযোগী শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণই আমাদের আছে, যেমন-যোগ্য শিক্ষকমন্ডলী, উন্নত লাইব্রেরী, আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাব,গবেষণা কেন্দ্র, পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদি। লিবারেল আর্টস শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত উন্নততর করা হচ্ছে। ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্টের জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। এ বছর সামার সেমিস্টারে শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ট্রেনিং সেশন অনুষ্ঠিত হবে। এসব আয়োজনে ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এসব আয়োজনে সর্বোতভাবে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

কা.ফাঃ ইউল্যাবের স্থায়ী নতুন যে ক্যাম্পাসটি হবে সেটির কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু বলবেন?

অ.হকঃ ইতিমধ্যে নতুন ক্যাম্পাসের জন্য ২৫ বিঘা জমি ইউল্যাবকে এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দান করেছে। রাজউক স্থায়ী ক্যাম্পাসের প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে। আশা করছি ২০১৩ সালের মার্চের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারবো। আমাদের বিশ্বাস, অল্প সময়ের মধ্যে আমরা স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করতে পারবো।

কা.ফাঃ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন।

অ.হকঃ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমি আমার জীবন দর্শনের কথা বলতে চাই। একটি সুন্দর জীবনের জন্য একজন মানুষের তিনটি জিনিসের প্রয়োজন: সততা, ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা।

কা.ফাঃ স্যার, আপনার বিষয়ে কিছু বলুন।

অ.হকঃ আমি পরিশ্রমী, তাই সুখী। কেননা, পরিশ্রমী মানুষকে কখনো দুঃচিন্তা স্পর্শ করতে পারে না।

কা.ফাঃ ধন্যবাদ, স্যার।

অ.হকঃ ভালো থেকো।

কানিজ ফাতেমা

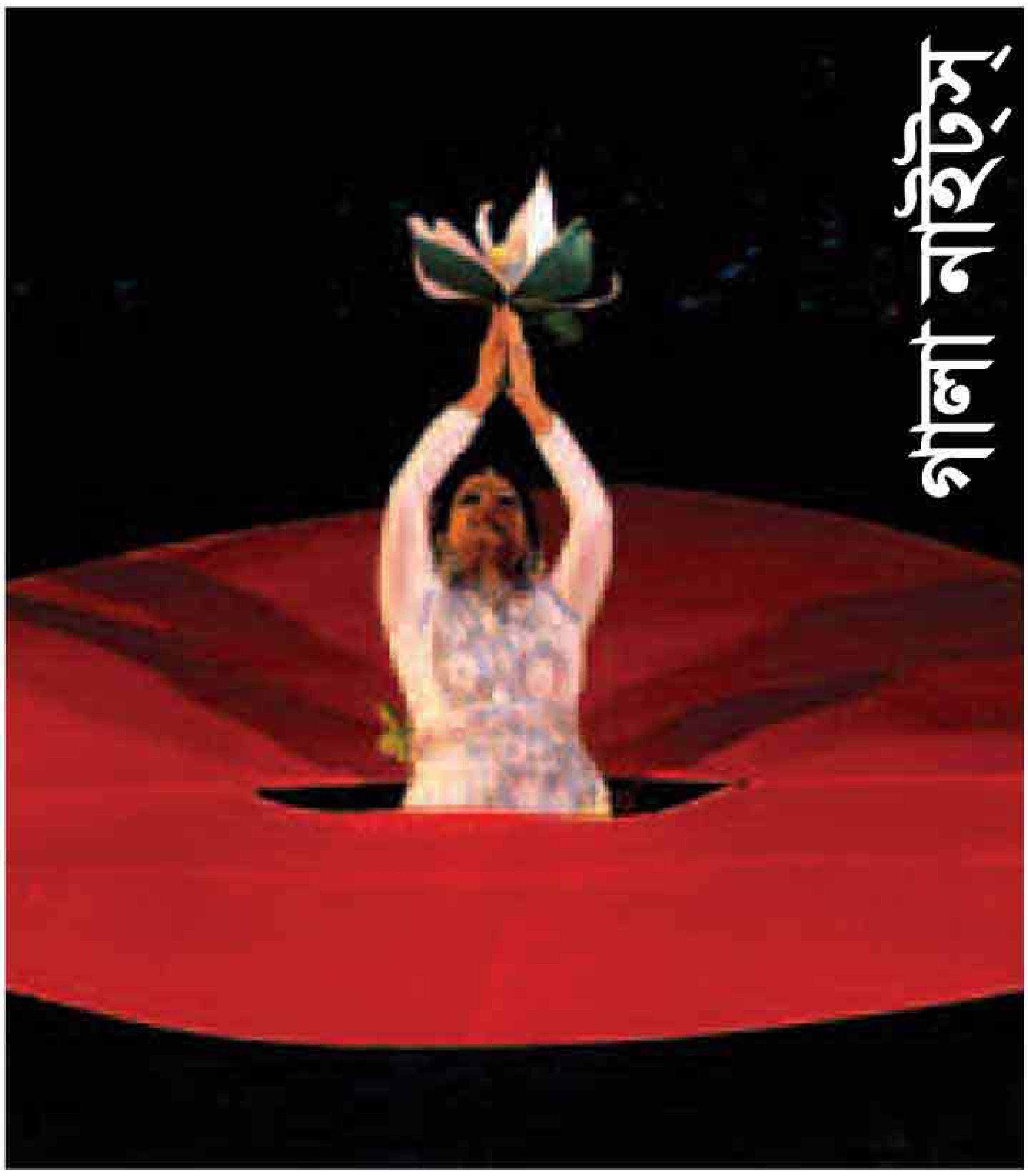

গালা নাইট্স্

সেরাতে প্রবেশ পথে ছিল লাল গালিচা অভ্যর্থনা, ছিল সুসজ্জিত মঞ্চ, আর ছিল আলোক বর্ণরেখায় উজ্জ্বল চারপাশ। সদ্য অর্জিত সফলতার আনন্দে শত শত মুখ ছিল গৌরবে জ্বলজ্বল। নব অর্জনের সুন্দরতম মুহূর্তগুলোকে স্বরণীয়, আরো বর্ণিল করতে এ মিলনমেলায় তাদের সাথে একত্রিত হয়েছিল সেই সকল মানুষ, যারা এ জয়ের নেপথ্যে সর্বদা তাদের সহযোগিতা করেছেন, পাশে থেকেছেন ও সাহস যুগিয়েছেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার। বলছি ১৮ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এর দ্বিতীয় সমাবর্তন'র গালা নাইটসের কথা। সদ্য স্নাতক উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের আনন্দকে আকাশছোঁয়া করতেই বিশেষ এ প্রয়াশ।

সকাল থেকেই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গণ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে ছিল মুখরিত, তবে গোধুলীবেলায় তাদের রঙ্গিন আগমন সমস্ত আয়োজনকে দিয়েছিল এক ভিন্ন মাত্রা।

ইউল্যাবে'র সাথে এ শেষদিনে "মেমোরিজ অব ইউল্যাব" শীর্ষক ডকুমেন্টারি ফিল্ম অনেককেই করে তুলেছিল আবেগঘন। ঠিক তারপরে ছিল ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইমরান রহমান এর বক্তব্য। কিন্তু, এখানে সবার জন্য অপেক্ষা করছিল একটি চমক!! ভাইস চ্যান্সেলর এর কণ্ঠ সেদিন গেয়ে উঠেছিল তার প্রিয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে। এখানেই শেষ নয়, ইউল্যাবে'র শিক্ষার্থী নাজিদা সুলতানা আর্নিক ও রওনক আফজা'র গায়কি মুগ্ধ করেছিল উপস্থিত সকলকে।

এ বিদায়বেলায় সকল ইউল্যাবিয়ানের জন্য নৃত্যাচলের উপস্থাপনা ছিল অনবদ্য। তবে গালা নাইট্সের শেষ অধ্যায়টুকু ছিল একেবারেই অন্যরকম। ওয়্যারফেজের উপহারস্বরূপ গাওয়া একের পর এক মন মাতানো গান, তার সাথে শিক্ষার্থীদের আনন্দ উল্লাস; আর সর্বশেষ আয়োজন ছিল ডিজে পার্টি। আনন্দঘন কিছু মুহূর্ত আর অনেক অনেক স্মৃতি নিয়ে শেষ হল 'গালা নাইট্স্ ২০১২'।

সাউদিয়া আফরিন

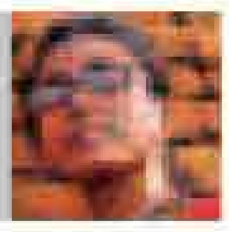

ক্যারিয়ার ফেয়ার ২০১২

"স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পূর্বে চাকরীতে যোগদান" শ্লোগান নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) প্রাঙ্গণে গত ১৯ ও ২৩ ডিসেম্বর ২০১২ উদ্‌যাপিত হয়ে গেল দু'দিনব্যাপী 'ক্যারিয়ার ফেয়ার ২০১২'। মেলার আয়োজনে ছিলেন ইউল্যাব ক্যারিয়ার সার্ভিস সেন্টার এবং বিডিজব্‌স্ ডট্ কম্।

১৯ ডিসেম্বর তারিখে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইমরান রহমান, ও বিডিজব্‌স্ ডট্ কম্ এর সিইও জনাব এ, কে, এম ফাহিম মাসরুর মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজ'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কাজী আনিস আহমেদ। এছাড়া ইউল্যাব-এর অন্যান্য কলাকুশলীরাও এসময় উপস্থিত ছিলেন ।

স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক, সিটিসেল, এম.জি.এইচ গ্রুপ, আব্দুল মোনেম লিমিটেড, এস.জি.এস বাংলাদেশ লিঃ, নেসানিয়া লিঃ, জানালা বাংলাদেশ লিঃ, বিডিজবস.কম এবং অমিকন গ্রুপসহ সর্বমোট ২১টি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে । এসব কোম্পানী প্রায় উনপঞ্চাশ ধরনের চাকরীর সুযোগ ও শিক্ষার্থীদের জন্য নানা তথ্য নিয়ে মেলায় উপস্থিত হয়েছিলো। অধ্যাপক ইমরান রহমান মেলা পরিদর্শন করেন এবং মেলায় আগত কোম্পানীগুলোর সাথে কথা বলেন ।

"জানালা বাংলাদেশ লিঃ" ইউল্যাবিয়ানকে জানান, "আমরা ইনফো সেন্টার নামে নতুন একটি প্রোগ্রাম চালু করেছি যেখানে বিভিন্ন কোম্পানীর ডাটা পাওয়া যাবে। যারা ব্যবসায় প্রশাসন এবং সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশোনা করছেন শুধুমাত্র তারাই এখানে আবেদন করতে পারবেন।"

বিবিএ ২য় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী হিমিকা হোসেন জানালেন "এ ধরনের মেলা তাদের চাকরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য বড় ভূমিকা রাখবে।"

মেলার ১ম দিন মেলায় ঘোষণাকৃত ৪৯টি পদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪১৪ জন বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের জীবনবৃত্তান্ত জমা দেয়, যার ভেতর থেকে প্রাথমিকভাবে ৩৮৭ জন প্রার্থীকে সাক্ষাতের জন্য নির্বাচিত করা হয়। মেলার ২য় দিন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে নির্বাচিত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেন। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন শিক্ষার্থী স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক, সি.এস.এল সফট্‌ওয়্যার লিঃ ও গ্লোবাল ব্র্যান্ড লিঃ এ চাকরীর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। আরও বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে সর্বশেষ সাক্ষাতের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

> এসব কোম্পানী প্রায় উনপঞ্চাশ ধরনের চাকরীর সুযোগ ও শিক্ষার্থীদের জন্য নানা তথ্য নিয়ে মেলায় উপস্থিত হয়েছিলো

আয়শা খান

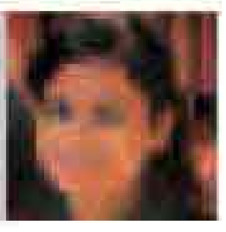

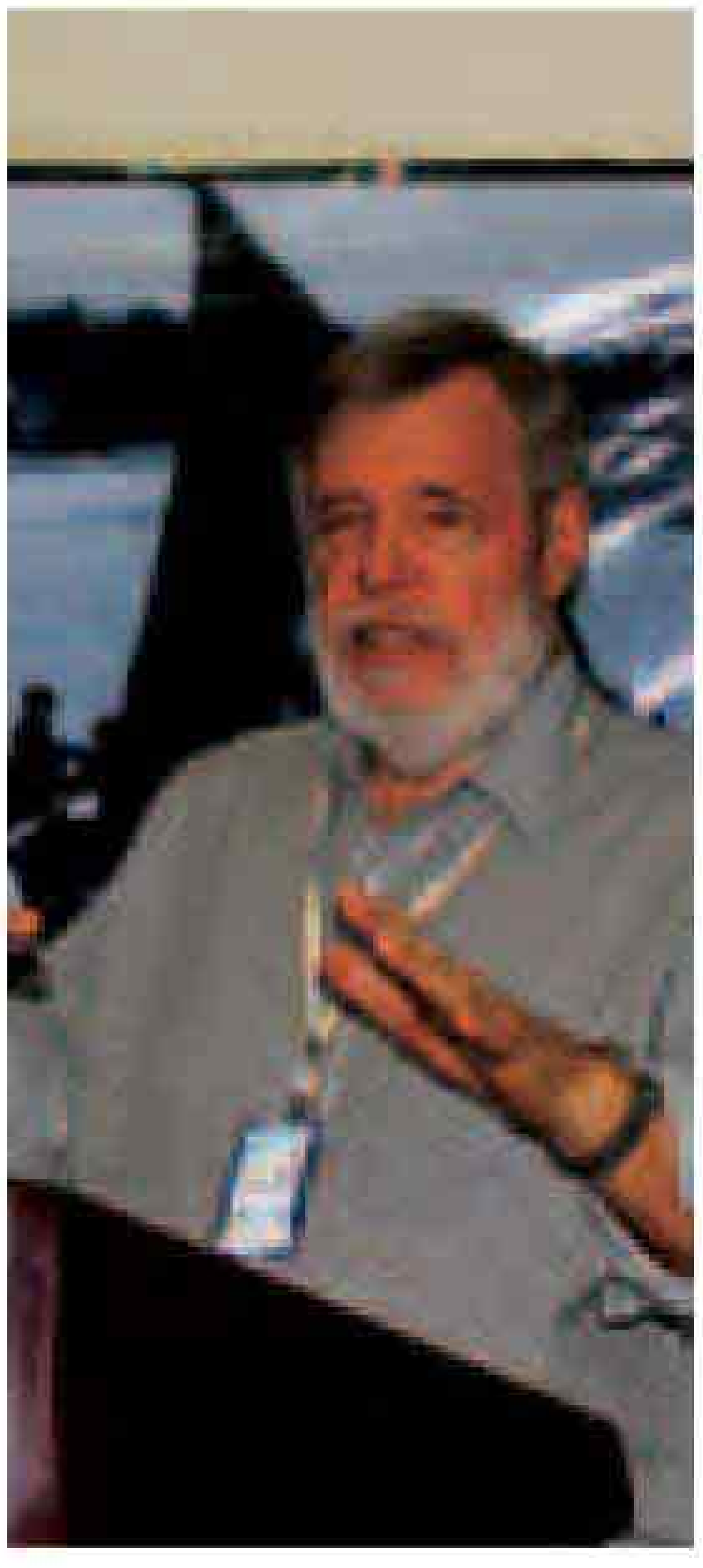
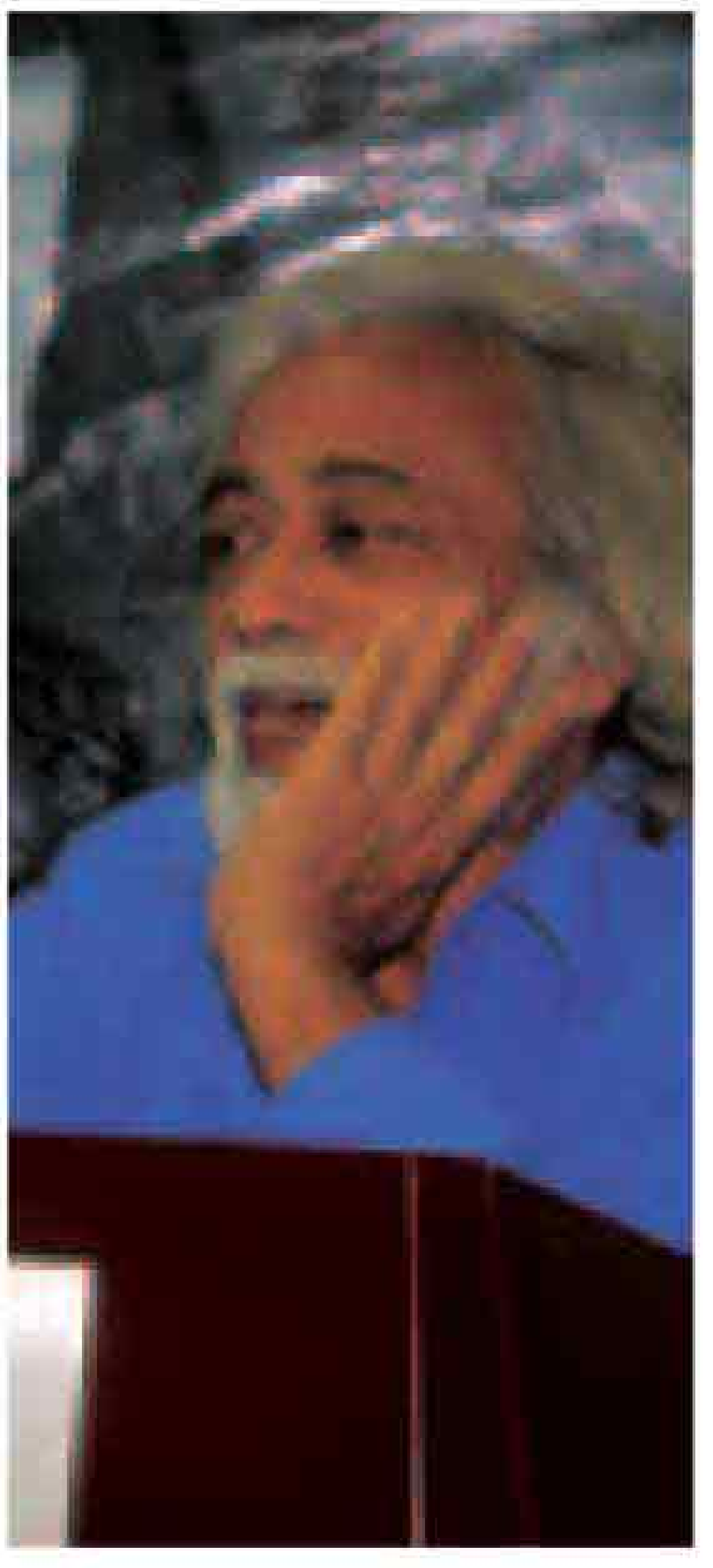

দোহার ১৯৭১ এবং আনোয়ার হোসেন

স্বনামধন্য চিত্রগ্রাহক ও আলোকচিত্রী আনোয়ার হোসেনের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোকচিত্র নিয়ে ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় ইউল্যাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আলোকচিত্র প্রদর্শনী "দোহার ১৯৭১"।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত বিজয়কে কেন্দ্র করে আয়োজিত প্রদর্শনীর প্রতিটি আলোকচিত্রে ফুটে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের স্বচ্ছ ও বাস্তব চিত্র। শিরোনামহীন ছবিগুলো যেন হাজারটি অর্থ নিয়ে সগৌরবে প্রজ্বলিত হয়েছিল ফ্রেমে ফ্রেমে। তাঁর ক্যামেরার ক্লিক অতঃপর সংরক্ষিত প্রতিটা মুহূর্ত সাক্ষী হয়ে আছে আমাদের বিজয়ের মহান ইতিহাসের অংশ হিসেবে। প্রতিটি আলোকচিত্র যেন সেই সময়ের এক একটি কঠিনতম বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন। আনোয়ার হোসেন এমন একজন আলোকচিত্রী, যে মুক্তিযুদ্ধের কঠিনতম বাস্তব মুহূর্তগুলোকে শুধুমাত্র ক্যামেরাবন্দি করেননি, বাস্তবিক অর্থে সেই মুহূর্তগুলোকে সংরক্ষিত করে রেখেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে "ফেরা" এবং "কমান্ডার মুয়াজ্জেম" শিরোনামের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক দুটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। "ফেরা" এর মূলভাব বিচারে এটি ইতিহাসের ব্রীজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। স্বল্প দৈর্ঘ্যের এ চলচ্চিত্র দু'টির পরিচালক ছিলেন সরয়ার তমিজউদ্দিন এবং চিত্রগ্রাহক আনোয়ার হোসেন।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ব্রায়ান সুস্মিত। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান জুড উলিইয়াম হেনিলো'সহ আরো অনেকে। অধ্যাপক জুড আলোকচিত্র নিয়ে তাঁর মতামত উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে শিল্পী আনোয়ার হোসেন উপস্থিত সবাইকে তাঁর কাজ এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। ইউল্যাবে এটি আনোয়ার হোসেনের তৃতীয় আলোকচিত্র প্রদর্শনী। তিনি এ পর্যন্ত তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির জন্য পেয়েছেন ৬০টির বেশী পুরস্কার।

মদিনা জাহান রিমি

ব্যাট্‌ল্ অব টেলিকম্

সম্প্রতি ইউল্যাব ইলেকট্রনিক্স ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল ব্যাট্‌ল্ অব টেলিকম্-এর আসর। টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম এবং চ্যানেল-এর বিভিন্ন বিষয়ে যাদের অগাধ বিচরণ তাদের জ্ঞান পরিসীমাকে একটু ঝালিয়ে নেয়ার জন্য এ কুইজ টেস্টের আয়োজন।

যদিও এ টেলিকম্ সেক্টর-এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের দখলে থাকে, কিন্তু, ইলেকট্রনিক্স ক্লাব ইউল্যাবের সকল ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থীর জন্য আয়োজনটি উন্মুক্ত রেখেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষার্থীরা টেলিকমের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে কতটা নিজেদের আয়ত্বে রেখেছে সেটাই ছিল এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

মোট ৩টি ধাপে কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হয়। প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ২১ নভেম্বর'১২ তারিখে বিকাল ৫.৩০ ক্যাম্পাস এ প্রাঙ্গণে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম পর্ব থেকে ২৪জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় দ্বিতীয় পর্বে। ৩৫ মিনিটের এ কুইজ টেস্টটিও একই সময়ে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় ২৪ নভেম্বর'১২ এবং এখান থেকে ফাইনাল রাউন্ডের জন্য ১২ জনকে নির্বাচন করা হয়।

এরপর ২৯ নভেম্বর'১২ তারিখে ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং ৫ জনকে চূড়ান্ত বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর'১২ তারিখ সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় এবং শুরুতেই ক্লাব উপদেষ্টা ফারহানা সাবরিনা প্রতিযোগিতাটির মূল উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও প্রাপ্তি নিয়ে মতামত প্রকাশ করেন। এর পরই বিজয়ীদের নাম ও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ফলাফল থেকে দেখা যায় টেলিকম যুদ্ধে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের শিক্ষার্থীদের আধিপত্য ছিল বেশী - ৫জন বিজয়ীদের মধ্যে ৪ জনই এই বিভাগের। বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন চারু ফেরদৌসী নাঈমা, প্রথম রানার আপ শাতিল আরাফাত এবং দ্বিতীয় রানার আপ নাজিফা নুসরাত আহমেদ। আজাদ আল রায়হান এবং প্রদীপ কুমার জয়কে প্রাইজ অফ এনকারেজমেন্ট প্রদান করা হয়।

ইভেন্টটি সফল করতে যারা ভূমিকা রেখেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন ক্লাব উপদেষ্টা ফারহানা সাবরিনা, ক্লাব প্রেসিডেন্ট মাকাম-ই-মাহমুদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট তারিফ মোহাম্মদ খান, জেনারেল সেক্রেটারি মোঃ তানভীর আহমেদ, ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারি ঈর্শিতা ইয়াসমিন, এবং অরগানাইজিং সেক্রেটারি আবু হাসান নাজমুল।

অনামিকা সিদ্দিকা

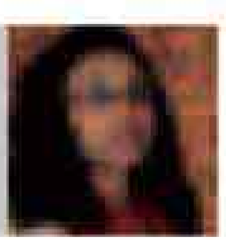

নী ল লো হি ত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বনামেই যার পরিচয়, পাঠক দরবারে এই জীবনশিল্পী তথা কথা সাহিত্যিককে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী শাখায় যারা মৌলিক অবদান রেখে নতুন আঙ্গিক দান করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাদের অন্যতম। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের ফরিদপুরের মাইজপাড়া গ্রামে। দেশ বিভাগের পর কলকাতায় স্থায়ী হলেও নাড়ির টানে তিনি বহুবার বাংলাদেশে এসেছেন।

স্কুল বয়স থেকেই বই পড়ার দারুণ নেশা। কিন্তু, বই কিনে পড়ার ক্ষমতা ছিল না। লাইব্রেরী থেকে কিংবা অন্যের বাড়ি থেকে চেয়ে বই পড়তেন। তাঁর বাবা ছিলেন টোলের পন্ডিত। বেশ কড়া মেজাজের। ছেলেকে ইংরেজী শেখাতে হাতে টেনিসনের একটি কাব্যগ্রন্থ দিয়ে বললেন, রোজ দুটো করে অনুবাদ করতে। যখন সুনীলের বন্ধুরা যাচ্ছেন সিনেমা কিংবা খেলা দেখতে তখন তার সময় কাটত অনুবাদ করে। এ ভয়াবহ কড়া নিয়ম থেকে তার মৌলিক কবিতা লেখার সুত্রপাত হয়। বন্ধুর বোনের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে লেখা প্রথম কবিতা "একটি চিঠি" ছাপা হয়ে যায় সে সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা "দেশ"-এ। দেখতে দেখতে এম এ পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। লেখালেখির প্রতি তীব্র ঝোঁকের কারণে সিদ্ধান্ত নেন পত্রিকা বের করার, যাতে তাঁর বয়েসী নতুন লেখকদের লেখা খুব সহজেই বের হতে পারে। অত:পর আদি কবি "কৃত্তিবাস" এর নামে জন্ম নিল "কৃত্তিবাস" পত্রিকা। পরবর্তীতে এ পত্রিকাকে ঘিরে পঞ্চাশ এর দশকের কবিদের একটা বড় সমাবেশ ঘটে। বাবা মারা যাওয়ার পর পুরো সংসারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে আসার পরও হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে চালিয়ে গেছেন তাঁর "কৃত্তিবাস" পত্রিকা।

১৯৬৩ সালে স্কলারশিপ নিয়ে পাড়ি জমান আমেরিকায়। পরবর্তীতে বিদেশভূম থেকে ফিরে এসে আবার শুরু করেন লেখালেখি। "দেশ" পত্রিকায় ছাপা হল তার প্রথম উপন্যাস "আত্মপ্রকাশ"। যাতে গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম সুনীল। নতুন ধারার কিছু করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেন তাঁর নিজের নাম। উপন্যাসটি তিনি তার নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল সাহিত্য হলো এমন স্থান যেখানে লেখকের মনোভাবের সাথে বাস্তব জীবনের কোন তফাৎ থাকবে না।

যদিও পরবর্তী সময় তাঁর ছদ্মনাম হিসেবে জন্ম নেয় নীললোহিত, সনাতন পাঠক, নীল উপধ্যায়। কবিতা, ছোটগল্প, কাব্যনাটক, ভ্রমন, স্মৃতিকথা, মহাকাব্যিক, পৌরাণিক রচনা, শিশু সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই ছিল তাঁর পদচারণ। নিজের দেশ, জাতি, মানুষের শেকড় খুঁজতে গিয়ে তিনি কখনো ডুব দিয়েছেন বাঙ্গালীর সুদীর্ঘ অতীত ইতিহাসে। আবার, মহাভারতের মাটি মেখে ভারতবর্ষের উৎসে পৌছানোর সময়েও সজাগ রেখেছেন সমকালের অভিজ্ঞতার চোখ ও দৃষ্টিভঙ্গি। মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও বিশালতা নিয়ে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত "প্রথম আলো" এক অসাধারণ গ্রন্থ, যেখানে তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ত্রিপুরা নামের রাজ-অন্তপুরের কাহিনী। ব্যক্তিগত মর্মযাতনা, ভালবাসার অপূর্ণতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে জাতিগত অধঃপতনের গ্লানি। বঙ্গদেশের তৎকালীন অবস্থা বোঝানোর জন্যই, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম আন্দোলন, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখের চিন্তাধারা, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ, রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের নানা রূপান্তর, দুর্ভিক্ষ, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ এসেছে অণুপুঙ্খভাবে। এছাড়া তাঁর উপন্যাসের ঐতিহাসিক ট্রিলজি-এর মধ্যে অন্যতম হলো "সেই সময়", "পূর্ব-পশ্চিম"।

ছোট-বড় মিলিয়ে অজস্র গল্প, উপন্যাস লিখে তিনি বারবার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অত্যন্ত নির্মোহ চোখ ও প্রখর অন্তর্ভেদী ক্ষমতাসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির। ইংরেজী সাহিত্যের লরেন্সের মত তিনি বাংলা উপন্যাসকে দিয়েছিলেন খোলা, মুক্ত জানালা।

একজন পাঠক হিসেবে আমি লক্ষ্য করেছি, উপন্যাসের মধ্যে কাহিনী, চরিত্রের ভিন্নতা। যেমন-তাঁর রচিত "সুখ অসুখ" একটি মনঃস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। যাতে তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্ককে তত্ত্বায়িত করার চেষ্টা করেছেন। প্রেমের সম্পর্ককে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন মনঃস্তাত্ত্বিক উপায়ে। তিনি বিয়ে নামক বন্ধনের বেড়াজালে শরীর ও সামাজিক সম্পর্কের উপরে স্থান দিয়েছেন মানুষের মনকে। "সরল সত্য" উপন্যাসটি তিনি আগাগোড়া লিখেছেন ডায়েরীর ভঙ্গিতে। যুদ্ধকালীন চাকরির বাজার এবং দাম্পত্য জীবনের মাঝে রচনা করেছেন সূক্ষ যোগাযোগ ক্ষেত্র। "কবি ও নর্তকী" এবং "স্বপ্ন লজ্জাহীন" দু'টি উপন্যাসই উল্লেখযোগ্য ফ্যান্টাসি প্রেমের উপন্যাস। সৌন্দর্য ও প্রেমের টানাপোড়েন কিভাবে মানব হৃদয়কে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে তা তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সম্পর্কের দায়বদ্ধতা জীবনকে কিভাবে অতিষ্ঠ করে তোলে তা তিনি বর্ণনা করেছেন নিপুণভাবে।

তাঁর উপন্যাস "মুক্ত পুরুষ" ও "ফুলমণি উপাখ্যান"-এ ব্যবহার করেন তাঁর ছদ্মনাম নীললোহিত। উপন্যাসটিতে সমাজের বহু প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে বেঁচে থাকার রহস্যময় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি লিখেছেন "অগ্নিপুত্র", "একা এবং কয়েকজন", "সেই সময়", "মনের মানুষ", "রক্তমাংস" ইত্যাদি। সে সময় কিশোরদের জন্য লেখা "কাকাবাবু" সিরিজ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীতে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস, "প্রতিদন্দ্বী" ও "অরণ্যের দিন-রাত্রি" নিয়ে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

বহু প্রতিভার অধিকারী এ লেখকের জনপ্রিয় কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো "কেউ কথা রাখে নি", "তুই একবার এসে দেখে যা নিখিলেশ", "হারিয়ে যেয়ো না নীরা" ইত্যাদি। এমন অসংখ্য কবিতার জন্য কাব্যানুরাগীদের কাছে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক সুনীলের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম ও অকৃত্রিম সুহৃদ। শৈশবের পর কলকাতায় গিয়ে স্থায়ী হলেও জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ ছিল প্রবল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে, ঘুরেছেন বিভিন্ন শরণার্থী শিবির। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন প্রবন্ধ, কবিতা ও উপন্যাস। সে সময় তিনি লিখেছেন "১৯৭১" নামের একটি কবিতা ও "অর্জুন" নামের উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর সঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন মার্কিন কবি এলেন গিন্সবার্গ। পরবর্তীতে তাঁর সাথে সুনীলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। এলেনের কবিতা "সেপ্টেম্বর ইন যশোর রোড"-এ সুনীলের নাম উঠে আসে।

সাহিত্যে তাঁর অবদান সুনীলকে দেশ ও জাতির জীবনে চিরস্থায়ী ও অপরিহার্য করে তুলেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে বারবার এসেছে আহ্বান, বহু পুরস্কার সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। "আনন্দ পুরস্কার" পেয়েছেন দু'বার। ১৯৮৩ সালে পান "বঙ্কিম পুরস্কার"। ১৯৮৫ সালে পান "একাডেমি পুরস্কার"। ছোটদের সাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্যে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার"। ২০০৫ সালে দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান "সরস্বতি"পেয়েছেন। বর্ধমান ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি লিট উপাধি দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর চিরস্মরণীয় অবদান স্বীকার করেছে। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে কলকাতায় একটি তথ্যচিত্র তৈরী হয়েছে।

শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবে যখন কলকাতা মাতোয়ারা, ইন্দ্রের পতনের মত বিদায় নিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ২৩শে অক্টোবর তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে অগণিত অনুরাগীর হৃদয় বিষাদময় হয়ে ওঠে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জীবন থেকে বিদায় নিলেও বাংলা সাহিত্যের হাজারো পাঠক ও অনুরাগীদের অন্তরে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

সানজিদা হক

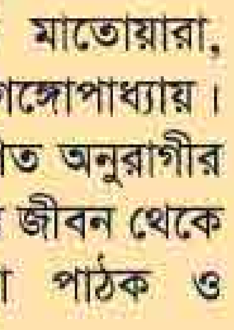

জহির রায়হানের চেতনায়
বর্তমান প্রজন্ম

বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম উত্তরাধিকার জহির রায়হান তাঁর বাস্তবিক শিল্প চেতনা সমসাময়িক লেখনীর মাধ্যমে বাংলা সংস্কৃতিতে যোগ করেছেন ভিন্ন মাত্রা। বাঙালির সাহিত্য জগৎ'কে করে তুলেছেন আরো বেশি সমাদৃত। মার্কস-লেনিনীয় চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ জহির রায়হানের শিল্পকর্মের অন্যতম প্রধান অলংকার। চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে বাস্তবিক ও বৈচিত্রপূর্ণ উপস্থাপনা তাঁর সাহিত্য শৈলীকে করেছে স্বতন্ত্র। বিশ্ব দরবারে নন্দিত এ কথা সাহিত্যিকের জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৯ আগষ্ট ফেনীর জেলার মজুপুর গ্রামে। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট ও পরে আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করে তিনি ফেনীর আমিরাবাদ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন ১৯৫০ সালে। এরপর তিনি ১৯৫১-৫৭ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালে ছাত্র অবস্থায় তিনি মহান ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য কারাবরণ করেন। ১৯৫৩ সালে জগন্নাথ কলেজ (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে এস.এস.সি পরীক্ষা দেন। এরপর ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ. সম্মান পাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ "সূর্য গ্রহণ" প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম সর্বকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে সিংহাসনে স্বীকৃত আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা কথা সাহিত্যের ব্যাপক পরিবর্তন আসে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ বিকাশের মাধ্যমে। আর বিকশিত সমাজের হাত ধরে বাংলা কথা সাহিত্যের নতুনতর জীবন চিত্রায়ন ও মূল্যবোধ রূপায়ণকে লেখনীর মূল চালিকা শক্তি হিসেবে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে জহির রায়হানের আবির্ভাব ঘটে। কথা সাহিত্যিক জহির রায়হানের রচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ব্যক্তিগত মতাদর্শ ও রাজনৈতিক সচেতনতায় এবং সমাজ ভাবনায় বুদ্ধি-যুক্তির সন্নিবেশ।

দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি জহির রায়হানের ছিল গভীর ভালবাসা। দেশের ক্রান্তিলগ্নে ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ছেঁড়া চপ্পল পাঁয়ে দিয়ে, পরিবারের মোহকে উপেক্ষা করে অকপটে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে জহির রায়হানের নাম আমরা যুগে যুগে স্মরণ করব। সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনায় উজ্জীবিত এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জহির রায়হানের প্রতিটি শিল্পকর্ম আমাদের বাস্তবিক চৈতন্যবোধের বিকাশ ঘটায়। তাঁর নির্মিত "জীবন থেকে নেয়া" চলচ্চিত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনার এক অপূর্ব বহিঃপ্রকাশ। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাঙালির মুক্তির সনদ ঘোষণা করার পর দেশের চীনাপক্ষী বিপ্লবীরা নেতিবাচক মনোভব গ্রহণ করে বাস্তবতা থেকে যে কতদূর চলে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে জহির রায়হানের "জীবন থেকে নেয়া" চলচ্চিত্রে। তিনি চলচ্চিত্রটিতে এক গোছা (ছয়টি) চাবি ব্যবহার করেছিলেন। যার মাধ্যমে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন- এই ছয়টি চাবির (ছয়দফা) মধ্যেই বাঙালির মুক্তির দিশা নিহিত।

> "জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৯ আগষ্ট ফেনীর জেলার মজুপুর গ্রামে। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট ও পরে আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করে তিনি ফেনীর আমিরাবাদ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন ১৯৫০ সালে। এরপর তিনি ১৯৫১-৫৭ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালে ছাত্র অবস্থাতে তিনি মহান ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য কারাবরণ করেন।"

এছাড়াও তাঁর সৃষ্ট শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে - স্টপ জেনোসাইড, অ্যা স্টেট ইজ বর্ন, হাজার বছর ধরে, কাঁচের দেয়াল, আরেক ফাল্গুন, বরফগলা নদী, শেষ বিকেলের মেয়ে, তৃষ্ণা ইত্যাদি। অকপটে বলা যায়, জহির রায়হানের বিচিত্র জীবন সংঘাত ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সংগ্রামের মতোই তাঁর সাহিত্য ও শিল্পে মধ্যবিত্ত জীবনচিত্র বিশ্বাসযোগ্য রূপে ফুটে উঠেছে যা বাংলা কথা সাহিত্যে 'মাইলস্টোন' হয়ে আছে। জহির রায়হানের সাহিত্য কর্মের তাত্ত্বিকতা শুধু নয়, এর সাথে তাঁর ভাষা সফলতা, বোধযোগ্য ভাবধারা এবং বিশ্লেষণের অভিনবত্ব আজীবন তাকে অমর করে রাখবে। খ্যাতিমান এ সাহিত্যিক ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারী তাঁর বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে নিখোঁজ হন। আজ তিনি নেই। কিন্তু, তাঁদের স্বপ্নের বাংলাদেশ আজও আছে মাথা উঁচু করে বিশ্বের মানচিত্রে, তিলে তিলে পৌঁছে যাচ্ছে উন্নতির শিখরে উৎকর্ষের প্রচন্ডতায়। জহির রায়হান স্মরণে বিশ্বকবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই,

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

কানিজ ফাতেমা

প্রেমা ধর
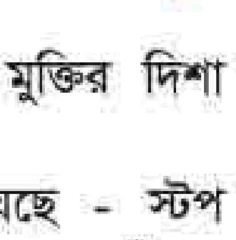

মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

মতিউর রহমান

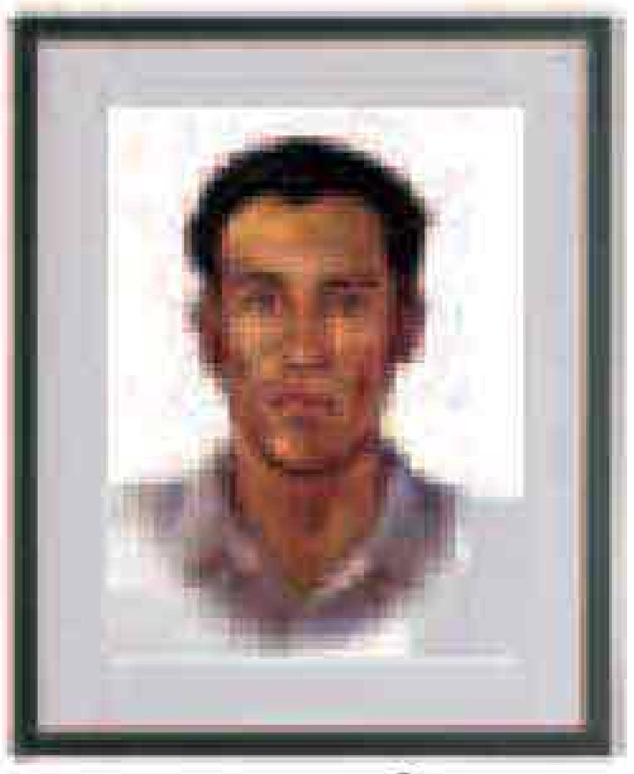

রুহুল আমিন

নূর মোহাম্মদ শেখ

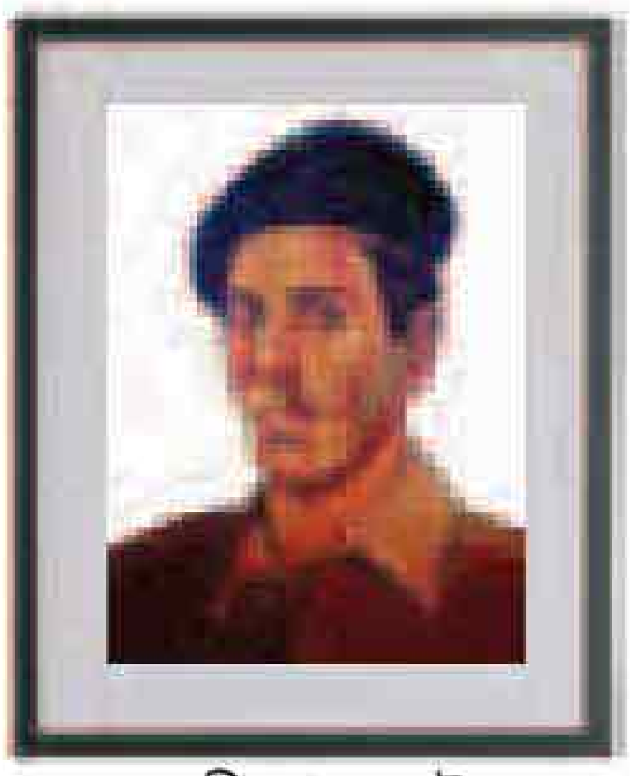

মুন্সী আব্দুর রউফ

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

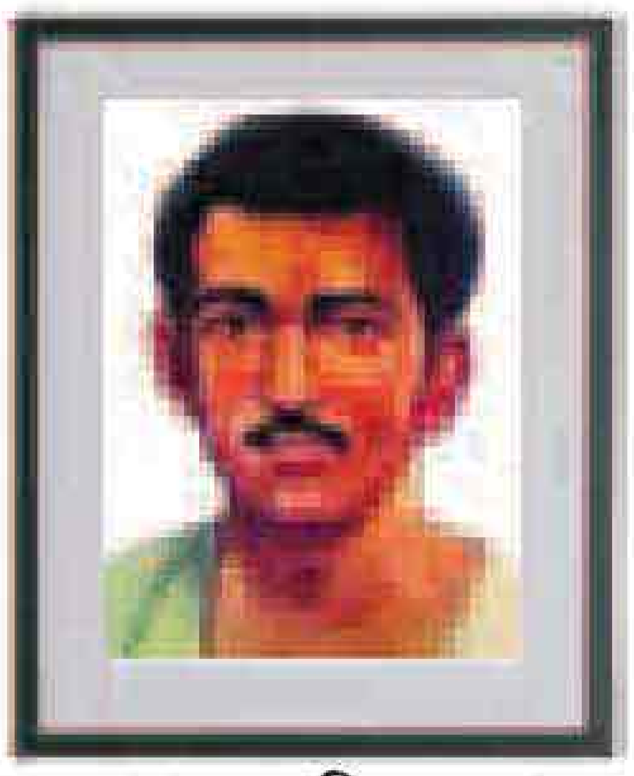

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

কষ্টের কোরাস

চে গেভারা এক আজন্ম বিপ্লবীর নাম। মৃত্যু বলতে যদি মানুষের দেহ চিরনিথর হয়ে যাওয়াকে বোঝায় তবে, চে বেঁচে নেই। সত্যিই কি নেই? না, চে বেঁচে আছেন তার মতাদর্শের মাঝে। চে গেভারা সেই প্রলেতারিয়েতের নাম যিনি সমাজের শোষিত, নিপীড়িত মানুষদের নিয়ে অসুস্থ মস্তিষ্কধারী 'মানুষের' প্রহসনের বিরুদ্ধে উন্মত্তচিত্তে লড়াই করেছেন, করতে শিখিয়েছেন। ত্যাগ-তিতীক্ষার এক জ্বাজল্যমান প্রতীক আর্জেনটাইন মার্ক্সবাদী এই পথিকৃৎ। তাইতো এতগুলো বছর পর এসেও চে'র দৃঢ়প্রত্যয়ী মুখ খুঁজে পাওয়া যায় টি-শার্ট, মগ, ক্যাপ সহ হরেক বস্তুতে। আজকের দিনে এখানে-ওখানে অনেক তরুণেরাই তাদের আদর্শ হিসেবে নিচ্ছেন চে কে। ১৯৬৭ সালে চের আত্মার প্রস্থান ঘটে। এর ঠিক চার বছর পর পৃথিবীর বুকে মুমূর্ষু অবস্থায় জন্ম নেয় একটি রাষ্ট্র, নাম বাংলাদেশ। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শহীদত্ব বরণ করে নেন ৩০ লাখ মানুষ। ২ লাখ মা-বোন তাদের ইজ্জত-আব্রু হারান। পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে বীরত্বগাঁথার জন্যে সরকারকর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক মর্যাদা 'বীরশ্রেষ্ট' উপাধি পান ৭ মহান যোদ্ধা। তাঁরা তাদের প্রাণ দিয়ে এ দেশের মানুষদের স্বাধীকার দিয়ে গেছেন। ঠিক যেন একজন গর্ভবতী মায়ের মত, যিনি একটি সুস্থ সন্তান জন্ম দিলেন, অথচ নিজে হারিয়ে গেলেন না ফেরার দেশে!

মুক্তিযুদ্ধের সাত বীরশ্রেষ্ঠের নামঃ

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর
ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান
সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

হালে বিপ্লবী চে গেভারার নাম আমরা অনেকেই চিৎকার করে বলতে পারি, কিন্তু কজনই বা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ এ সাত শ্রেষ্ঠ সন্তানের ত্যাগের ইতিহাস জানি? সাত বীরশ্রেষ্ঠের নামগুলো বলতেই কমবেশি সকলে আজ আমরা হোঁচট খেয়ে থাকি। ভয় হয়, জাতি হিসেবে দিনকে দিন বাঙ্গালী কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়ছে! ৪০ বছর আগের মুক্তিযুদ্ধ বেচে অনেকেই স্বার্থসিদ্ধি করে নিচ্ছি, অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধেই এখনো অনেকে অন্ধকারে। মানুষ হিসেবে সত্যিই অদ্ভুত আমরা, তাই না? মাঝেমধ্যে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করি, আসলেই কী আমরা 'মানুষ' হতে পেরেছি?

তাশফিক মাহমুদ

তাচ্ছিল্য নয়
চাই সমর্থন

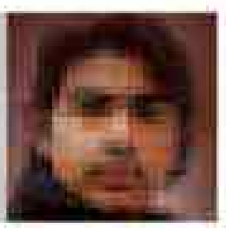
ফজলে রাব্বি খান

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতে অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক এম এ জলিল অনন্ত একটি বহুল আলোচিত নাম। তবে এ আলোচনা-সমালোচনা যা কিছু তাকে নিয়ে চলছে এর মূলে রয়েছে তার ভাষা দক্ষতা।

অনন্ত জলিলের সমস্যা তার ভাষা উচ্চারণ। বিশেষ করে ইংরেজী উচ্চারণে তার বেশ সমস্যা রয়েছে। একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা যিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের পরিচিতি তুলে ধরছেন তার যদি ভাষা উচ্চারণে অদক্ষতা থাকে তাতে শুধু তিনি নিজেকে ছোট করছেন না, নিজ দেশের মানুষের মর্যাদাও ক্ষুন্ন করছেন। কাজেই ভাষা ব্যবহারে অদক্ষতা যে বড় সমস্যা এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে, এটা এমন কোন সমস্যা নয় যার কোন সমাধান নেই। অবশ্যই এর সমাধান রয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুশীলন করে তিনি তার এ সমস্যা দূর করতে পারেন।

অনন্ত জলিল বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে যে অবদান রাখছেন তা বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়। অথচ, এটি বিবেচনা তো দূরের কথা বর্তমানে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণমাধ্যম পর্যন্ত তাকে নিয়ে মজা করছে, তাকে কৌতুকের পাত্রে পরিণত করা হয়েছে।

সে বিষয়ে পরে আসা যাক, আগে ব্যক্তি এম এ জলিল অনন্তকে তুলে ধরা প্রয়োজন। জন্ম মুন্সিগঞ্জে। বড় হয়েছেন ঢাকার শুক্রাবাদে। পাঁচ বছর বয়সে তার মা মারা যান। বড় হয়েছেন বাবা ও বড় ভাইয়ের হাত ধরে। পড়াশুনা করেছেন ব্যবসায় প্রশাসন ও ফ্যাশন ডিজাইনিং এর উপর। বর্তমানে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তিনি একই সাথে এজিআই গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ও মুনসুন ফিল্মজ লিঃ এর চেয়ারম্যান। এজিআই এপারেলস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, এফআরএম ফ্যাশন হাউজ লিঃ সহ এরকম আরও আটটি কোম্পানি তার এজিআই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবসায় সফল এ শিল্পপতি একসময় অনুভব করেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের রুগ্নাবস্থা। ফলশ্রুতিতে এগিয়ে আসেন চলচ্চিত্র প্রযোজনায়। অধিক বিনিয়োগকৃত প্রযুক্তি নির্ভর বাংলা ছবি 'খোঁজঃ দ্য সার্চ' উপহার দেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে। চলচ্চিত্রটি তার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মুনসুন ফিল্মজ লিঃ থেকে নির্মাণ করা হয়। এক সাক্ষাৎকারে অনন্ত জলিল বলেন, "আমি বাংলাদেশের দর্শককে চমকে দিতে চাই। তারা জানুক বাংলাদেশে বিশ্বমানের সিনেমা হয়। বাংলাদেশের সিনেমা কোনভাবেই পিছিয়ে নেই। এজন্য যা যা করণীয় আমি তাই করছি। ইতোমধ্যে আমি দর্শককে এ ম্যাসেজটুকু অন্তত দিতে পেরেছি, যে আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী সিনেমা হচ্ছে।"

২০১০ সাল থেকে ২০১২ এর ঈদুল আযহা পর্যন্ত তার মোট চারটি ছবি মুক্তি পায়। যার মধ্যে 'খোঁজঃ দ্য সার্চ'এরপর 'হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ' একটু কম ব্যবসায় সফল হলেও পরবর্তী ছবি 'দ্য স্পীড্' এবং গত ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া 'মোস্ট ওয়েলকাম' পুরোপুরি ব্যবসা সফল হয়। তিনি এখন তার পরবর্তী ছবি 'নিঃস্বার্থ ভালোবাসা'-এর শুটিং শেষ করতে থাইল্যান্ডে গিয়েছেন। পাশাপাশি পরিকল্পনা করছেন 'মোস্ট ওয়েলকাম টু' নির্মাণের। তিনি বলেন, "সব শ্রেণীর দর্শককে হলমুখী করার জন্যই আমার সিনেমা নির্মাণে আসা। দর্শকদের প্রত্যাশা মাথায় রেখেই আমরা 'মোস্ট ওয়েলকাম টু' নির্মাণ করবো।" তার সিনেমা নির্মাণে আসার উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে বটে! রাজধানীর এক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র আরিফুল ইসলাম বাবু 'মোস্ট ওয়েলকাম' দেখে তার অনুভূতি ব্যক্ত করলেন এভাবে, "ছবির প্রিন্ট, শব্দমান, লোকেশন সব কিছুই অনেক ভাল। এ চলচ্চিত্রটি দেখে দেশের চলচ্চিত্রের মান বাড়ছে কি কমছে সে দিকে না গিয়ে আমি তার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।"

এ সফল ব্যবসায়ী তার অর্জিত অর্থ একে একে ব্যয় করছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে উন্নত করার লক্ষ্যে। এর আরেকটি উদাহরণ হলো-'নিঃস্বার্থ ভালোবাসা' কে ত্রিডি ভার্সনে রূপান্তরের চিন্তা, যেটি হবে বাংলাদেশের প্রথম ত্রিডি চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ। মোট কথা গত দু'বছরে তিনি চলচ্চিত্র নিয়ে যা উদ্যোগ নিয়েছেন, এবং যা করার পরিকল্পনা করছেন তা একসময় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে পুরোপুরি বদলে দিবে এমন প্রত্যাশা করাটা অন্যায় নয়।

চলচ্চিত্র জগতে তার এ স্বল্প পথচলায় অনেকগুলো ব্যাপার আমার নিজেরও ভাল লাগেনি। আমার ভাল লাগেনি বলে আমি তাকে অপমান করব এমনটিও ঠিক নয়। কিন্তু, বাস্তবে সেটিই হচ্ছে। সম্প্রতি ধানমন্ডির একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে তাকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে তা আসলেই লজ্জার। আমাদের মতনই কিছু তথাকথিত আধুনিক ছেলেমেয়ে তাকে 'বাংলা সিনেমার নায়ক' বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিল। এরপর তার উচ্চারণ নিয়েও উত্যক্ত করলে একপর্যায়ে তিনি ও তার স্ত্রী চিত্রনায়িকা বর্ষা উঠে চলে আসতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন টিভি চ্যানেল তার সাক্ষাৎকার নেয়ার নামে তাকে খুব ভদ্র ভাবে অপমান করে। একটি প্রতিষ্ঠিত এফএম রেডিও তাকে কৌতুকের পাত্র করে একটি অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রচার করেছিল।

অনন্ত জলিলকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের এ সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে চলচ্চিত্রের উন্নয়নে তার উদ্যোগকে কিভাবে সঠিক পথে এগিয়ে নেওয়া যায় সে দিকটি ভাবতে হবে, তাকে সহায়তা করতে হবে।

অপরূপ কথা

জানুয়ারী ২০১৩

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) এর দ্বিতীয় সমাবর্তন ২০১২ তে স্কলারশিপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর একাংশের সফলতার বিজয়গাঁথা তুলে ধরা হল ইউল্যাবিয়ানের পাতায়।

রেবেকা বদিউজ্জামান ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান যেদিন আমাকে জানালেন যে 'তুমি ভ্যালিডিক্টরিয়ান হিসেবে মনোনীত হয়েছ', সেদিন আমার মনটা প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল। গ্রাজুয়েশন এর আগে ভাল ফলাফলের জন্য 'ন্যামড' স্কলারশিপ পেয়েছিলাম যা ছাত্রজীবনের এক বিশাল অর্জন। এরপর সমাবর্তনে পেলাম সর্বোচ্চ এ সম্মান। যেদিন পুরষ্কার গ্রহণ করলাম এবং বিদায়ী ভাষণ দিলাম, তখন মনে হলো যে আমার সব কষ্ট, চেষ্টা যেন আজ স্বীকৃতি পেল। এ এক বিরল সম্মাননা। কেননা, মাত্র একজন শিক্ষার্থী এর জন্য মনোনীত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, আমি ভালো ফলাফলের জন্য আরো দুটি পুরষ্কার পেয়েছি -'স্বর্ণ পদক' এবং 'সুমা কাম লড'।

এ অর্জনে আমার বাবা, মা এবং ছোট দুই বোন সবসময় আমাকে মানসিকভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। তারা সব ভাঙ্গা-গড়াতে আমার পাশে ছিল। শিক্ষকরা প্রত্যেকেই যুগিয়েছেন উৎসাহ এবং দিয়েছেন নির্দেশনা। বিশেষ করে - ড.শাহনাজ হুসনে জাহান, অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার চোধুরী, শাহনেওয়াজ কবির, নাসরিন ইসলাম, সাজেদুল হক, আরিফুল ইসলাম, জুডিথা ও'ম্যাকার এর কথা না বললেই নয়।

যখন আমার কোন প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়া হতো তখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরো উৎসাহ পেতাম। সেরকম একটি স্বীকৃতি হল আমার শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্তি যা ভবিষ্যতে আমাকে কি অর্জন করতে হবে তার সীমা ঠিক করে দেয়।

ইউল্যাবকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আলাদা করেছে এর এক্সট্রা-কারিকিউলার কার্যক্রম। নিয়মিত পড়ালেখার পাশাপাশি তাই আমি ক্লাবে খুব সক্রিয় ছিলাম। সবসময় নিজের প্রতিভা আবিস্কারের চেষ্টা করতাম ওসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমার শিক্ষক ও বন্ধুগণ আমাকে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছে। পাশাপাশি 'নিউ এইজ' এর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'এক্সট্রা'তে সহকারী সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছি। এছাড়া ক্যাম্পাস রেডিওতে সংবাদ পাঠক হিসেবে, ইউল্যাব ইয়েস, ডিবেট ক্লাবসহ আরো অনেক আনুষঙ্গিক কাজে আমার অংশগ্রহণ ছিল নিয়মিত।

অধ্যয়নের পাশাপাশি আমি গত ৬ বছর যাবৎ শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত আছি। মুলত আমি ইংরেজী এবং জার্মান এ দু'টি ভাষা শিক্ষা দেয়ার সাথে জড়িত। ভবিষ্যতেও এ পেশায় থাকতে চাই। আমার স্বপ্ন 'ইংলিশ ল্যাঙগুয়েজ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং' নিয়ে গবেষণা করা। কারণ, এ ভাষাকে তৃণমুল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে চাই। এছাড়া বর্তমানে বিবিসি জানালা'র একটি ভিন্নধর্মী প্রজেক্টে কাজ করছি।

'বি ডিফরেন্ট' এ কথাটা মেনে নিজের একটা বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তৈরী করাটা জরুরী। মহাত্মা গান্ধীর এ কথাটা অর্থাৎ পরিবর্তন দরকার এটা না বলে নিজেকে সে অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে, তাহলেই পৃথিবীটা কে অনেক সুন্দর মনে হবে।

▶ নাজমুছ সাকিব প্রকৃতি

মোহাম্মাদ জায়েদ মাওলা ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ

প্রথম যখন জানতে পারলাম যে আমি এবার গোল্ড মেডেল পেতে যাচ্ছি তখন এতটাই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম যা বলে বোঝানো যাবে না। নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। আমি সবসময়ই পড়াশোনায় মনযোগী ছিলাম। যারই প্রতিফলন হচ্ছে এ গোল্ড মেডেল প্রাপ্তি।

আমার মনে হয় ভাল রেজাল্ট করার জন্য ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। এটা প্রতিটি মানুষের কাছে আলাদা। তবে একজন ছাত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিজেকে বোঝা, আর তাই সবসময়ই নিজেকে জানার চেষ্টা করেছি যে আমার কতটুকু করার ক্ষমতা আছে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করেছি।

ইউল্যাবের ইংরেজি বিভাগে পড়াশুনা করার কারণে পাঠ্য বই হিসেবে অনেক ভাল লেখকের বই পড়ার সুযোগ হয়েছে। খুব পছন্দ করি ও'হেনরি এবং আর্থার কোনান ডয়েল এর ছোট গল্প পড়তে।

আমার এ অর্জনের পেছনে শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে মোহিতুল আলম স্যার, কায়ছার হক স্যার, সাইখ-উস-সালেহিন, জাফর মাহমুদ, শাহ্নেওয়াজ কবির, জাকির হোসেন মজুমদার, তাহমিনা জামান ও নাসরিন ইসলাম প্রমুখ-এর কথা না বললেই নয়।

নতুনদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই - ভালো মার্কসের জন্য না পড়ে জানার জন্য পড় এবং পড়াটাকে উপভোগ করতে চেষ্টা কর, তাহলেই সাফল্য আসবে। তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে - যেকোন বিষয়ে শিক্ষকদের সহয়তা নেয়া এবং পড়াশোনা বিষয়ক যে কোনো সমস্যা আলোচনা করা।

▶ সৌরভ ঘোষ

কামরুন্নাহার মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

গোল্ড মেডেল পাওয়ার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ আশাতীত। যে কোন ধরনের অ্যাওয়ার্ড বা সম্মাননা জীবনের একটি নতুন প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়।

ইউল্যাব-এ এমবিএ প্রোগ্রামে আমার কোর্স ৪র্থ সেমিস্টারেই শেষ হয়ে যায় এবং একই সেমিস্টারে আমাকে ভাইস চ্যান্সেলর স্কলারশীপ দেয়া হয়। এছাড়াও ডিপার্টমেন্ট থেকে ৯টি স্কলারশীপ দেয়া হয়, যার মধ্যে ৭টি স্কলারশীপ আমার পরীক্ষার ফলাফলের এর উপর পেয়েছিলাম। তখন এগুলোই আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছিল। তাই গোল্ড মেডেল পাওয়ার আনন্দটা সত্যিই ছিল অন্যরকম।

এমবিএ প্রোগ্রাম খুব অল্প সময়ের। তাই রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা করার মত উদ্দীপণা থাকে না। এছাড়া পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি, পরিবার এবং পারিবারিক জীবন নিয়েও ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই পড়ালেখায় নিয়মিত হওয়া ব্যাপারটি খুব সহজ ছিল না। এক্ষেত্রে ক্লাসে যা পড়ানো হয় সেটা পরিস্কারভাবে বুঝে নেয়া এবং ক্লাসে নোট লেখার অভ্যাস থাকাতে পড়াটা সহজ মনে হতো। এছাড়া বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে যদি উদাহরণ হিসেবে কাজে লাগানো যায়, তাহলে খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হয় না।

বর্তমানে আমি সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োজিত আছি। ভবিষ্যতেও এ পেশাটাকে নিয়েই সামনে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা আছে এবং এ অর্জন ইচ্ছাটাকে আরো ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

শিক্ষকদের সহযোগিতা এবং নিজের মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের কারণে আজকে আমি এ অবস্থানে আসতে পেরেছি।

▶ আয়শা খান

ঘুম নেই

গ্রন্থ পর্যালোচনা

"ঘুম নেই। ক্লান্ত পাতা দু'টো ভারী হয়ে নেমে আসে চোখের ওপর। চারদিকে চেপে বসা অন্ধকার। রাত দু'টো। চোখ দু'টোর পাতার নীচে ওদের ছায়া। নড়ে চড়ে উঠে আসে। ওরা হেঁটে বেড়ায়। আমি ঘুমোতে পারি না। এমনি করে নিদ্রাহীন রাতগুলো যায়।"

উপরের লাইনগুলো পড়ে মনে হতে পারে কোন কবিতার পঙক্তিমালা, কিন্তু তেমনটি নয়। 'ঘুম নেই' গ্রন্থটি কবিতার মত পাঠককে যেমন নিয়ে যাবে বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে, তেমনি নিয়ে যাবে একাত্তরের সেই দিনগুলোতে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত নাট্যকার ও মুক্তিযোদ্ধা নাসিরউদ্দিন ইউসুফের লেখা 'ঘুম নেই' এমন একটি গ্রন্থ যা গল্প নয়, উপন্যাসও নয়; আবার একে স্মৃতিচারণও বলা যায় না। অতি সুপাঠ্য ছোট্ট এই বইটি শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না।

বইটি পড়ার সময় চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেসব মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, যারা স্বাধীন একটি দেশের জন্য হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। ঘরে অসুস্থ মা, প্রসূতি স্ত্রী, বুড়ো বাবা সবাইকে রেখে কী এক অদ্ভুত টানে ছুটে গিয়েছিলেন দেশকে স্বাধীন করার জন্য। ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছিল তরুণী মেয়েগুলো; কিসের ডাকে, কোন সে ভালোবাসায়, কে জানে? 'ঘুম নেই'তে বিবৃত হয়েছে সেই মহান মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প, যাদের শরীরের চেয়ে বড় ছিল রাইফেল, আর রাইফেলের চেয়ে বড় ছিল তাদের অন্তর। তাদের শরীর চিরে বেরিয়ে গিয়েছিল বুলেট। তাঁরা বুকে অসীম সাহস নিয়ে যুদ্ধ করত আর বলত,'আমরা বাঁচতে আসিনি। আমরা মরতে এসেছি।' সেসব মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে ঘুম নেই, যারা একটি স্বাধীন দেশ চেয়েছিল। ঘুম নেই তাদের চোখে, যারা স্বাধীন দেশে ক্ষেতের ধান ঘরে তুলে দু'বেলা খেয়ে-পরে সুখে থাকতে চেয়েছিল। তারা করুণা চায়নি, চেয়েছিল প্রাপ্য সম্মান অথচ তারা আজ সেই প্রাপ্য সম্মানটুকু পাচ্ছেনা। সেসব মুক্তিযোদ্ধারা এখন বেঁচে থেকেও মৃত। এমন স্বাধীন দেশ তারা চায়নি। তাদের আত্মত্যাগ কি তবে বৃথা গেল?

বইটি শেষ করে পাঠকের মন হতাশায় ছেয়ে যেতে পারে। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

বইটির ভাষা ও বিন্যাস চমৎকার। খুব সাধারণভাবে লেখক বলে গিয়েছেন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাদের মনের কথা। সবচেয়ে বড় কথা হল বইটিতে প্রাণ রয়েছে। পাঠক বইটি শুরু করা মাত্রই এর ভিতরে প্রবেশ করে ফেলবে। চোখের সামনে ভেসে উঠবে একাত্তরের দিনগুলো। মন বিষাদে ভরে উঠবে মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করে। বইটির ব্যাপ্তি কম হলেও তা যে কোন পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে। কিছু কিছু সংলাপ মনের মাঝে গেঁথে থাকবে বহুকাল । সত্যিই তো, আমরা তো এমন স্বাধীনতা চাইনি। স্বাধীনতার কতটা ব্যবহার আমরা করতে পেরেছি তা নিজের কাছেই প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে।

ঘুম নেই সেসব যোদ্ধাদের, যারা মরতে পারেনি যুদ্ধে। স্বাধীন দেশে তারা বুকে অশান্তি নিয়ে বেঁচে আছে। ঘুম নেই কিন্তু জেগেও তো নেই!

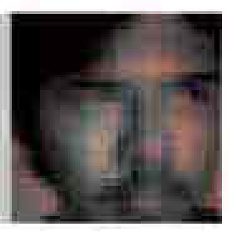
সজল বি রোজারিও

চলচ্চিত্র পর্যালোচনা

ঘেটুপুত্র কমলা

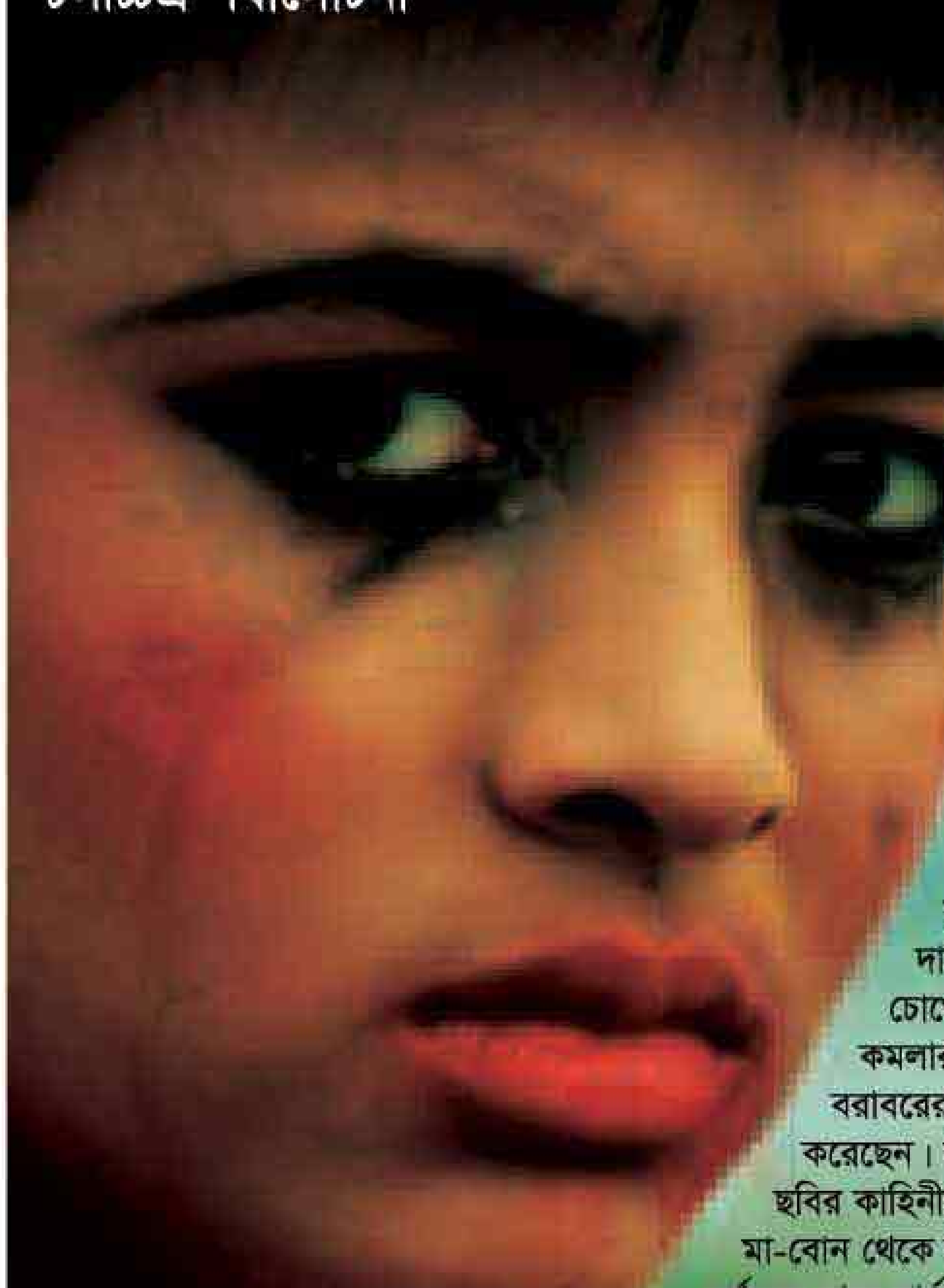

যেহেতু হুমায়ুন আহমেদের চলচ্চিত্র তাই প্রত্যাশাটা ছিল বিশাল। এটা অবশ্য একটা অভ্যাসগত বিষয়ও হতে পারে। অনেকটা এভাবে ভেবে নেওয়া যে, কোন একজন বড় মাপের পরিচালক আর লেখকের চলচ্চিত্র বা লেখনি সব সময় ভাল হতেই হবে। এর ব্যতিক্রম যেন অসম্ভব। তবু কেন যেন অজান্তেই মনের মাঝে বাসা বাঁধে অনেক আশা।

'ঘেটুপুত্র কমলা'র কাহিনী ছিল একেবারেই কল্পনাপ্রসূত। একজন জমিদারের সাথে একটি কিশোরের সমকামী সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আর্বতিত হয়েছে চলচ্চিত্রটির কাহিনী যার প্রেক্ষাপট আজ থেকে দেড়শত বছর আগে হবিগঞ্জ জেলার জলসুখা গ্রামের এক বৈষ্ণব আখড়া। যেখানে ঘেটুগান নামে একটি নতুন সঙ্গীত ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। কিশোরেরা কিশোরীর বেশে নাচ-গান করে ধনী জমিদার, চৌধুরীদের মনোরঞ্জন করত। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে জমিদার বাড়িতে আনন্দ দিতে এসে জমিদারের বিকৃত জৈবিক লালসার শিকার হতে হয় ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রকে। এভাবেই সেলুলয়েডে ফুটে উঠে কমলা, একজন কিশোরের বিষাদময় জীবনচিত্র। সমকালীন নারীদের করুণ অবরোধবাসিনী রূপটিও চলচ্চিত্রটির একটি মুখ্য বিষয়। যেখানে নারীদের নিজেদের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। ধর্মকে সাথে রেখে কিভাবে অন্যায় চলে আমাদের উচুতলায় তারই প্রকাশক হিসেবে দেখা যায় ধর্মপ্রাণ চৌধুরীর লালসার শিকার কিশোর মামুনের করুণ চিত্র।

ছবির লোকেশন আর অভিনয় শিল্পীদের কাজ ছিল অসাধারণ। তবে কাহিনীটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার হওয়া সত্ত্বেও ঠিক কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা ছিল। যথারীতি হুমায়ূন আহমেদের কাহিনীর জমিদাররা যেমন দাম্ভিক হন এখানকার জমিদারও এর ব্যতিক্রম নন। ধনী-গরিবের বা মুনিব-ভৃত্যের যে পার্থক্য তা এখানেও চোখে পড়েছে। তবে, সেখানে অভাব ছিল উপযুক্ত জৌলুসের ।

কমলার চরিত্রে ছোট্ট ছেলেটি নিঃসন্দেহে দারুণ অভিনয় প্রতিভা দেখিয়েছে। জয়ন্ত চট্টোপধ্যায়ের অভিনয় বরাবরের মতো ক্ষুরধার প্রশংসা কুড়োনোর মতো বোধ হয়নি। তমালিকা কর্মকার ভিন্ন ধরনের চরিত্রে ভালোই করেছেন। বাকি সবার অভিনয় ছিল প্রশংসাযোগ্য।

ছবির কাহিনীতে কমলা নামক চরিত্রটির ঘেটুপুত্র হবার বিষয়টি নিঃসন্দেহে কষ্টকর একটা বিষয়। ছেলেটির দুঃখ আর মা-বোন থেকে দূরে থাকার চিত্রগুলো সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে সামান্য তুচ্ছ কারণে তাকে মেরে ফেলাটা দর্শকের কাছে সার্বজনীনভাবে যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। হয়তোবা তখনকার জমিদার আমলে মানুষের জীবনের মূল্য কতটা নগণ্য ছিল এটাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু, বিষয়টির আরেকটু যৌক্তিক উপস্থাপন কাম্য ছিলো।

'চলচ্চিত্রটি সমকামিতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে' এমন একটা দোষারোপ অনেক মহল থেকেই। ঘেটুপুত্র কমলা দেখে মানুষ সমকামিতায় আকৃষ্ট হতে পারে, এমনটাও বলছেন কেউ কেউ। তাদের যুক্তি ছিল, নিষিদ্ধ যৌনাচার নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রটি সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, বিশেষ করে শিশুদের উপর। জীবদ্দশায় হুমায়ূন আহমেদ শিশুদের উদ্দেশ্যে এজন্য বলেছিলেন- "বাচ্চাদের প্রতি অনুরোধ রইল তোমরা এই ছবি দেখোনা।" পরিশেষে বলতে হয়, ছবিটির গল্প থেকে বিকৃত যৌনাচারের গন্ধ খোজা থেকে বিরত থাকাটাই বোধহয় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে।

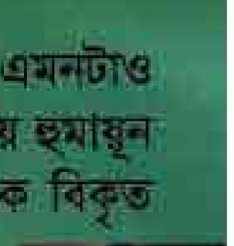
জাহিদ হাসান

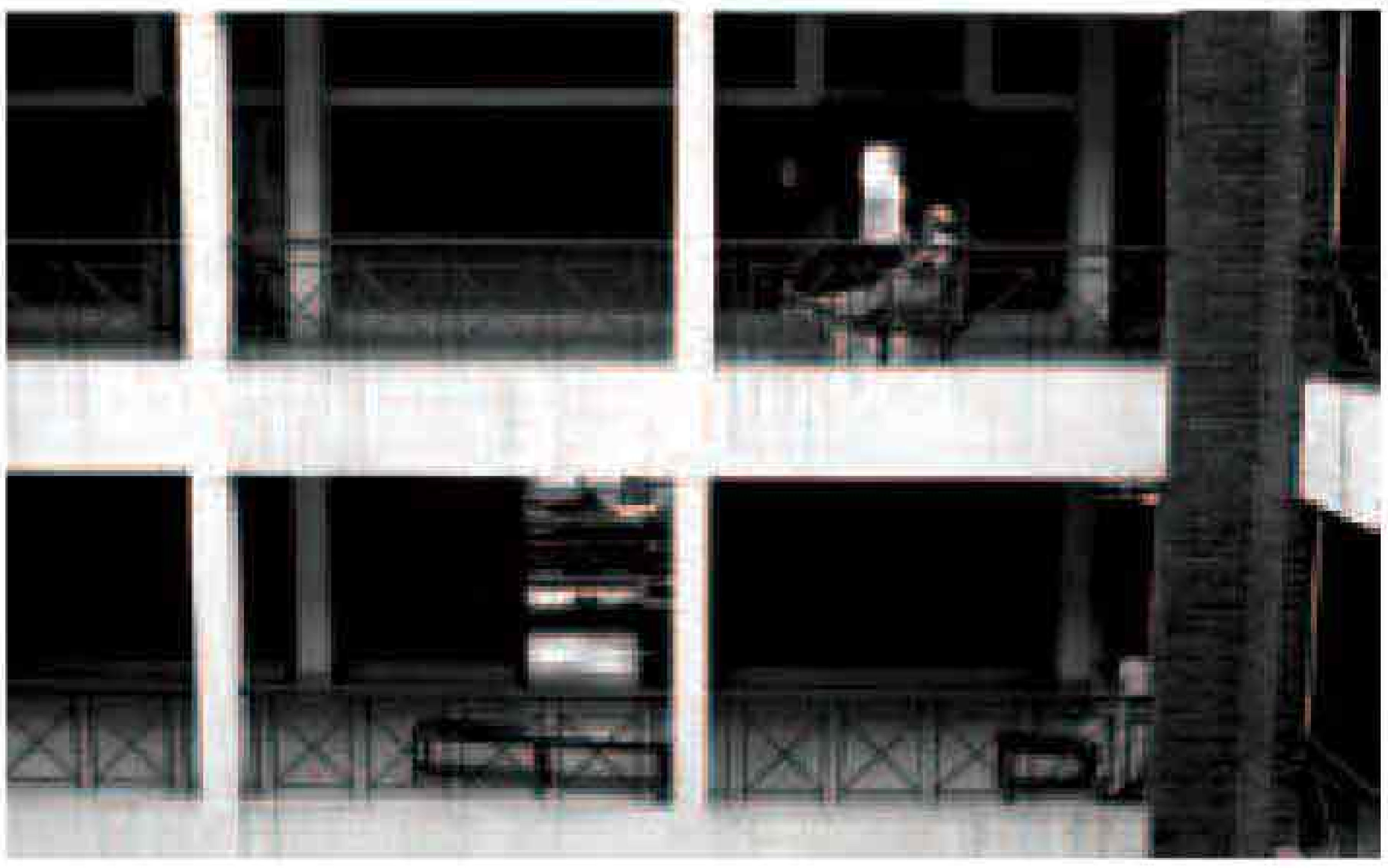

বৃদ্ধাশ্রম

ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত অফিসার
মস্ত ফ্ল্যাটে যায়না দেখা এপার ওপার
নানান রকম জিনিস
আর আসবাব দামী দামী
সবচেয়ে কমদামী ছিলাম একমাত্র আমি।
ছেলের আমার, আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম
আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম...

এ কথাগুলো নচিকেতার কণ্ঠে শুনলে যতটুকু কষ্টের দোলা জেগে উঠবে আপনার মনে, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট অনুভব হবে আপনি যখন নিজেকে আবিষ্কার করবেন বৃদ্ধাশ্রমে।

আমরা ক'জন বন্ধু মিলে সেদিন গিয়েছিলাম ঢাকার আগারগাঁও-এ অবস্থিত একটি বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে যাওয়ার পর আমরা আর নিজেদের ঠিক রাখতে পারলাম না। বৃদ্ধাশ্রমে দাদা-দাদী, নানা-নানীদের করুণ অবস্থা দেখে আমাদের পক্ষে ছবি তোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তারপরও প্রয়োজনের তাগিদে তুলতে হল তাদের কিছু ছবি।

আমরা যখন ছোট্ট শিশুটি ছিলাম তখন না বুঝে অনেক ভুল করেছি, বাবা-মা আমাদের সেসব ভুলকে ক্ষমা করে আমাদেরকে বুকে টেনে নিয়েছেন। শুনেছি বৃদ্ধ বয়সে মানুষ নাকি শিশু হয়ে যায়। কিন্তু, তখন আমরা আর তাদেরকে সহ্য করতে পারিনা।

এমন একটা সময় আসে যখন আমাদের কাছে তারা বোঝা হয়ে যায়। মাথার বোঝা ঝেড়ে ফেলাই তো মানুষের কর্ম!! মানুষ বলে তাদের হয়তো একেবারে ছুড়ে ফেলে দিতে পারিনা। কিন্তু, জন্মদাতা পিতামাতাকে একাকী জীবনে ঠেলে দেওয়া কি মানুষের কর্ম হতে পারে?

সিউল আহমেদ